জাদুশিল্প এবং একজন জুয়েল আইচ

কাইউম পারভেজ

তখন আমি যশোর পিটিআই স্কুলের ছাত্র। সময়টা ১৯৬৪-৬৫ হবে। যশোরের ষষ্টিতলা পাড়ায় আমার স্কুল এবং বাস। একদিন এ্যাসেমবিলিতে সুপারেনটেনডেন্ট স্যার ঘোষনা দিলেন আগামী মঙ্গলবার স্কুলে একজন জাদুকর আসবেন আমাদেরকে জাদু দেখাতে। সেদিন টিফিন পিরিয়ডের পর আর কোন ক্লাস হবে না - আমরা জাদু দেখবো। আমাদের সে কী উত্তেজনা আমরা জাদু দেখবো। কল্পনায় নিজেকে একজন জাদুকরই বানিয়ে ফেললাম। আর তো তর সয় না। কেন মঙ্গলবার আসে না।

মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলে হাজির হয়েছি। কোন ভাবেই এ জাদু মিস করা যাবে না। যাহোক টিফিনের পর সবাই গিয়ে হল ঘরে জড় হলাম। সবাই চেঁচামেঁচি করছে যার যার প্রেডিকশন নিয়ে- জাদুকর দেখতে কেমন, তারা কী খায়, কেমন করে জাদু বানায় (?) ইত্যাদি। হঠাৎ হল ঘর নিশ্চুপ হয়ে গেল দেখলাম সুপারিনটেনডেন্ট স্যার মেয়েদের মত লম্বা চুলআলা কালো সার্ট কালো প্যান্ট পরা লম্বা এক লোককে নিয়ে মঞ্চে (ছোট্ট একটা সামান্য উঁচু কাঠের পাটাতন) উঠে এলেন। স্যার বললেন ইনিই সেই জাদুকর এবং এঁর নাম শের আলী। এবার শের আলী দু একটা কথা বললেন যেন আমরা কেউ ভয় না পাই। তারপর তাঁর জাদু শুরু করলেন। তো প্রথমে তিনি একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে হাতে থাকা রুমালটা দিয়ে তাঁর মাথার ওপরে ঝুলন্ত জ্বলন্ত ইলেক্ট্রিক বাল্বটা খুলে নিয়ে রুমালের মধ্যেই রাখলেন। তারপর ওটাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে পানি দিয়ে ঢগঢগ করে গিলে ফেললেন। আমরা তালি দিয়ে হল ফাটিয়ে ফেললাম। এরপর তিনি রেজার বের করে একটু শেভ করে নিয়ে তারপর ধুয়ে ব্লেডটা বের করে নিলেন। এবার বাল্বের মত করেই ব্লেডটাও চিবিয়ে নিয়ে পানি দিয়ে গিলে ফেললেন। এভাবে জ্বলন্ত আগুন মুখে পুরে দিয়ে নেভানোসহ হরেক রকমের জাদু (?) তিনি দেখালেন। শেষ জাদুটা ছিলো হলের বাইরে শের আলী তাঁর মাথার লম্বা চুল দিয়ে থেমে থাকা একটা জীপকে টেনে নিয়ে গেলেন বেশ খানিকটা।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম এই যদি ম্যাজিক হয় তাহলে আমিও তো ম্যাজিক দেখাতে পারি। দু'একবার প্রাকটিস করে পাড়ার পোলাপানকে ঢোল দিলাম আমি ম্যাজিক দেখাবো। নির্দিষ্ট দিনে আম্মার শাড়ী চুরি করে ঘেরা দিয়ে মঞ্চ বানিয়ে আমিও শের আলীর মত বাল্ব ভাঙ্গা কাঁচ আর ব্লেড চিবিয়ে এক ঢোঁক পানি খেয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলাম। তো একদিন এক শো তে দেখি আম্মা হাজির। লাফ দিয়ে যে এক দৌড় দিলাম তো ম্যাজিক ওখানেই শেষ। রাতে আম্মার দু হাত আর শলার ঝাড়ু ম্যাজিকের মত কাজ করছিলো আমার পিঠে গায়ে সর্বত্র। এক সময়ে ক্ষ্যান্ত দিয়ে আম্মা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমার সাথেই কাঁদতে থাকলেন - তুই আমার একটা মাত্র ছেলে তুই জানিস তুই কী সর্বনাশ করছিস? তারপর আম্মা তাঁর মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে আজ থেকে আমার ম্যাজিসিয়ান জীবনের এখানেই ইতি। আমি শর্ত সাপেক্ষে প্রতিজ্ঞা করলাম। শর্তটা হলো ব্যাপারটা কোনভাবেই আব্বাকে বলা যাবে না নইলে ওখানে আমার আরেকটা ম্যাজিক শো দেখতে হবে।

পত্রপত্রিকা ওয়েবসাইটে দেখলাম একুশে একাডেমির আয়োজনে

জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ আসছেন সিডনি কাঁপাতে। বিজ্ঞাপনটা দেখেই তখন আমার নিজের জাদুকারীর কথা মনে হলো। তবে আমরা ছোট বেলায় যা দেখেছি সেগুলো হলো জাদুকারী আর জুয়েল আইচ যা করেন তা জাদুশিল্প। চোখের চাউনিসহ দৈহিক ভাষা-পরিভাষা শিল্প-নৈপুণ্যে ভরপুর, চমৎকার উপস্থাপনায় দর্শক-শ্রোতাকে তিনি নিয়ে যান ফ্যান্টাসির জগতে, যেখানে সবই রম্য, সবই সুন্দর, সবই বিস্ময়কর। প্রতিটি শোর প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকের মনকে আলোড়িত করে তাঁর প্রতিভার আলো। জাদু কী করে দর্শক-শ্রোতাকে অনুভূতির নতুন এক জগতে নিয়ে যায় তা বুঝতে হলে অবশ্যই বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের জাদু দেখতে হবে। তখনই বোঝা যাবে জাদু কেমনতর শিল্প। তার আগে একটু জেনে নেই তিনি কেমন করে জাদুশিল্পী হলেন (নিশ্চয়ই শের আলীকে দেখে নয়!)

শৈশবে জুয়েল আইচ রূপকথা এবং জাদুর গল্প শুনতে খুবই পছন্দ করতেন। মায়ের কাছে রূপকথা এবং জাদুর গল্প শুনতে শুনতে মনের অজান্তেই জাদুবিদ্যার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। নিজ বাড়ির আঙিনায় এক বেদে জাদুকরের জাদু দেখে বিস্মিত হন জুয়েল আইচ। কাঠের তিনটি বাটির নিচে কাপড়ের তিনটি বল রেখে কি তাজ্জব জাদু দেখালেন তিনি! তার জাদু দেখে অবাক হলেন শিশু জুয়েল আইচ। আর তখন থেকেই জাদু শেখার বাসনা তার মনের মধ্যে অনবরত ডানা ঝাপটাতে থাকে। কিন্তু বেদে জাদুকরটির তেল চিটচিটে কাপড়ের বল, আর তার অনাহারি রুগ্ন-ভগ্ন শরীর এবং ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের অসহায়ত্বের যে ছাপ অবয়বে ফুটে উঠেছিল- তা দেখে ওর মতো ম্যাজিশিয়ান হওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছে হল না। তখন জাদুকরদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ।

১৯৬৫ সাল। জুয়েল আইচ তখন পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময়ে পিরোজপুরে তাঁবু ফেলেছিল বিখ্যাত 'সাধনা লায়ন সার্কাস'। জাদুশিল্পী হিসেবে এ সার্কাস দলের নিয়মিত পারফরমার ছিলেন প্রখ্যাত জাদুশিল্পী প্রফেসর আবদুর রশিদ। সিদ্ধহস্ত জাদুশিল্পী প্রফেসর আবদুর রশিদের নিপুণ জাদু দেখে স্তম্ভিত হলেন তিনি। তদুপরি জাদুসম্রাট পিসি সরকারের (সিনিয়র) লেখা 'ম্যাজিকের খেলা', জাদুগির আলাদেনের লেখা 'অভিনব ম্যাজিক' গ্রন্থ দুটি পড়েও অনুপ্রাণিত হন। একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও জাদুশিল্পকে পেশা হিসেবে নিয়ে পি সি সরকার দিব্যি জীবনযাপন করছেন জানতে পেরে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হলেন জুয়েল আইচ।

১৯৭১ সালে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি যোগ দেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। ৯ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত স্বরূপকাঠি এবং ঝালকাঠির সুবিশাল পেয়ারা বাগানের গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণে পাক বাহিনী ছিল ভীতসন্ত্রস্ত। জুয়েল আইচ ছিলেন বিশাল বিস্তৃত সেই পেয়ারা বাগানের গেরিলা যুদ্ধের সাহসী এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে জুয়েল আইচের পিরোজপুরের বাড়ির সব জিনিসপত্র প্রথমে লুট করে নেয় তাঁদেরই এক প্রতিবেশী দালাল পরিবার। এ সময় তাঁর ম্যাজিকের সব যন্ত্রপাতি, বাঁশি, ছবি আঁকার ইজেল, রং-তুলি, ক্যানভাস, বইয়ের লাইব্রেরি, যাবতীয় পুরস্কার, নিজের আঁকা সব চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, তিল তিল করে জমানো জীবনের সব সঞ্চয় লোপাট হয়ে যায়। বলতে ভুলে গেছি তাঁর প্রতিভা কেবল জাদুতেই থেমে থাকে নি। তিনি যেমন বাঁশী বাজান তেমন ছবিও আঁকেন। তিনি নিজেই একটা কিংবদন্তী শিল্প - কিংবদন্তী শিল্পী।

১৯৭২ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে পরবর্তীতে শিক্ষকতায় এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর ঢাকাতে, চলচ্চিত্র তৈরির ওপরে যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড ফিল্ম স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন।

১৯৭১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাহাদুরপুর শরণার্থী ক্যাম্পের স্কুলে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অনুপ্রেরণা দান এবং শিক্ষকতা করার মাধ্যমে মূলত বিদেশের মাটিতেই তাঁর শিক্ষকতা জীবনের ভিত রচিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে ১৭ ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই জুয়েল আইচ শিক্ষকতা পেশার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কথা চিন্তা করলেন। ঢাকা শহর ছেড়ে তিনি চলে গেলেন গ্রামে। উদ্দেশ্য গরিবদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সমুদয়কাঠি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পড়ানোর সময় রাগারাগি না করে সুন্দর সুন্দর গল্প বলে, উপমা দিয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় করে, জাদু দেখিয়ে প্রয়োজনে কৌতুক বলে, নিজের তৈরি নানা রকম খেলনা ও সরঞ্জামের সাহায্যে কিছুটা খেলা এবং কিছুটা কাজের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ এবং আশা জাগিয়ে তুললেন ছাত্রদের মধ্যে। স্কুলবিমুখ নিঃস্ব ছাত্রছাত্রীরা ব্যতিব্যাস্ত হয়ে উঠতে শুরু করল স্কুলে আসার জন্য। দূর-দূরান্তের ছাত্ররা এসে দলে দলে ভর্তি হতে শুরু করল সমুদয়কাঠি হাইস্কুলে। স্কুল ভরে উঠল কানায় কানায়। গড়ে তুললেন পাবলিক লাইব্রেরি। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও নতুন প্রাণের জোয়ার এলো চারদিকে। এলাকাবাসীর জোর দাবির মুখে মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে হল।

হঠাৎ ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৭৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একদল দুর্বৃত্ত তাঁর ম্যাজিক সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে দেয়। তখন তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিটুল করের বাড়িতে রিহার্সাল করতেন এবং জাদু নিয়ে গবেষণা ও পড়াশোনা করতেন। ওই বাড়িতেই থাকত তাঁর জাদুর সব সরঞ্জাম ও প্রদর্শনীর উপকরণ। নির্বাচন নিয়ে নিটুলের সঙ্গে স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার দ্বন্দ্ব বাধে। এক পর্যায়ে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে দ্বিতীয় দফায় (প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সময়) আবার নিঃস্ব হলেন তিনি। এ সময় তিনি স্কুল শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ম্যাজিক ইনস্ট্রুমেন্ট নতুনভাবে তৈরি করার কাজে মনোযোগী হন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের আহ্বানে ফিরে আসেন ঢাকায়।

এ দেশের জাদুশিল্পের রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। বিশ্ববাসী বাংলাদেশকে জাদুবিদ্যার সূতিকাগার হিসেবে চেনে। তাই তিনি জাদুশিল্পের পুনঃজাগরণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু করলেন নিরলস সাধনা।

তিনি শুধু একজন বিশ্ববিজয়ী জাদুশিল্পীই হতে চাননি, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাদুর পুনঃজাগরণ চেয়েছেন। একদিকে জাদুর শৈল্পিক উৎকর্ষের জন্য কাজ করেছেন, অন্যদিকে গণ-সচেতনতা জাগানোর জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

জাদুর মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশপ্রেম, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সমকালীন সমস্যা, প্রকৃতি প্রেম, মানব সেবা, জাদুর ইতিহাস-ভূগোল, প্রাগৈতিহাসিক জাদু, আজকের জাদু, আগামী দিনের সম্ভাব্য জাদু, শিক্ষামূলক ম্যাজিকের ধাঁধা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, নারী নির্যাতন, ড্রাগ থেকে মুক্তিসহ অগণিত বিষয়কে উপজীব্য করে জাদু প্রদর্শন করে বিনোদনের পাশাপাশি তিনি মানুষকে সচেতন করে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

মিউজিক ও ম্যাজিক এ দুটি বিষয়ে তাঁর সমান দূর্বলতা। একটিকে আরেকটির সম্পূরক মনে করেন। সেভাবেই তাঁর বড় বড় ইলিউশনগুলো প্রদর্শনকালে মিউজিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন। ফলে দর্শক-শ্রোতা চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ হন। পৃথিবীতে জুয়েল আইচই একমাত্র জাদুশিল্পী, যিনি তার জাদুর আবহ সঙ্গীত হিসেবে খেয়াল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুল প্রসাদ, নজরুল সঙ্গীত, সেতার, বাঁশী ইত্যাদি ব্যবহার করেন। আগেই বলেছি তাঁর বাঁশীর সুর তাঁর জাদুর মতই মোহনীয় বিস্ময়।

জুয়েল আইচ একজন ভাল লেখক এবং পাঠক। অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লেখালেখি করেন। তিনি একজন বাস্তববাদী লেখক। সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখে থাকেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তাঁর এসব লেখা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও 'অন্তরালের আমি' নামে আত্মজীবনীমূলক একটি তথ্যবহুল সুখপাঠ্য বই লিখেছেন তিনি। ম্যাজিকের সরঞ্জামীদির পর তাঁর বাসগৃহে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় বিষয়টি হলো তাঁর লাইব্রেরী। অনেকে বলেন এমন ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ নাকি ঢাকা শহরে দ্বিতীয়টি নেই।

দেশের শিল্প-সাহিত্য, সাংবাদিকতায় সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার একুশে পদক। এই পদক প্রদানের সর্বোচ্চ কমিটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠান। এত বড় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে জুয়েল আইচ খুবই খুশি হন। কিন্তু পুরো চিঠি পড়ে তার মন খারাপ হয়ে যায়। চিঠিতে বলা হয় 'জাদুবিদ্যায়' তাঁকে একুশে পদক প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। জুয়েল আইচ তাদের চিঠি লিখে জানান, "আমি জাদুশিল্পের অনুশীলন করি- 'জাদুবিদ্যার' নয়। বাংলায় জাদুবিদ্যা একটি গুপ্তবিদ্যা হিসেবে তথাকথিত অলৌকিক কুসংস্কার, মন্ত্রতন্ত্র, তুক তাকের চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। মানুষকে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন করে তোলাও শিল্পীর এক পবিত্র দায়িত্ব। অতএব 'জাদুবিদ্যায়' একুশে পদক গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অবশেষে জুয়েল আইচ 'জাদুশিল্পে' একুশে পদক পান। প্রকৃত শিল্পী জুয়েল আইচের সাহসী ভূমিকায় জাদু এখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত শিল্প।

১৯৮০ সালে 'সোসাইটি অব আমেরিকান ম্যাজিশিয়ানস' তাদের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় সদলবলে জাদু প্রদর্শনের জন্য। ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিকাল গাইড ইউএসএ থেকে প্রকাশিত 'হু ইজ হু ইন ম্যাজিক' বলে, 'জুয়েল আইচের আবিষ্কৃত মঞ্চ মায়াগুলো এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপে সাজানো ক্লাসিক জাদুগুলো বিশ্ব জাদুভান্ডারে মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে'। বিশ্ববিখ্যাত জাদু গবেষক 'জেমস র‍্যান্ডি' সারা পৃথিবীর জাদুর ইতিহাসের আদিকাল থেকে আধুনিককালের উল্লেখযোগ্য সব জাদুশিল্পীদের ওপর এক ব্যাপক গবেষণা করেন। অবশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুশিল্পীদের একটি তালিকা করেন। এতে জাদুর সব শাখা, যেমন ক্লোজআপ, ক্যাবারে, কমেডি, মেন্টাল ম্যাজিক, বন্ধন মুক্তি, ভেন্ট্রিলোকুইজম এবং বৃহদাকার মঞ্চমায়া সৃষ্টিকারীদের নাম স্থান পায়। সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ২৯৫ জন জাদুশিল্পীর নাম আছে। সেখানে জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের প্রশংসা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। বিশ্বখ্যাত জাদু বিশেষজ্ঞ 'ডোনাল্ড ডিউইন্টার' লন্ডনের

বিখ্যাত 'ডমিনিয়ন থিয়েটারে' জুয়েল আইচের শো দেখে লেখেন, 'এ এমনই এক অবিস্মরণীয় অনুভূতি যা বর্ণনা করা যায় না, যা শিখে আয়ত্ত করা যায় না। এ একান্তই সহজাত প্রতিভা, যা নিয়ে জন্মাতে হয়।' লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় প্রেক্ষাগৃহ 'হ্যাকনি এম্পায়ারে' ১৮ জুন ১৯৮৯ তারিখে, দর্শকদের সারিতে ছিলেন অসংখ্য মুগ্ধ জাদুকর। অনুষ্ঠান শেষে 'জুয়েল আইচ সংবর্ধনা কমিটির' পক্ষ থেকে তাকে ট্রফি দেন ইংল্যান্ডের সেরা জাদুশিল্পী 'পল ডেনিয়েলস'। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'জুয়েল আইচের প্রতিটি জাদুই যেন এক একটি বিস্ময়কর গল্প; তা তিনি কথা বলেই করুন অথবা নিঃশব্দে উপস্থাপন করুন। এই হলে তবেই তো জাদু শিল্প হয়ে ওঠে।' বিশ্ববিখ্যাত জাদুশিল্পী ডেভিড কপারফিল্ড বলেন, 'বন্ধু, জোর কদমে এগিয়ে চলো। ম্যাজিক তোমাকে চায়।'

লেখক হুমায়ূন আহমেদ তার 'ম্যাজিক মুনশি' উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন:
'জুয়েল আইচ
জাদুবিদ্যার এভারেস্টে যিনি উঠেছেন।
এভারেস্ট জয়ীরা শৃঙ্গ বিজয়ের পর নেমে আসেন।
ইনি নামতে ভুলে গেছেন।'

এই হলো সেই জুয়েল আইচ যিনি শের আলীদের জাদুকরীকে স্বীয় সাধনায় আন্তর্জাতিক জাদুশিল্পে আসীন করেছেন। জাদুকে শিল্পকলার একটি আসনে পৌঁছে দিয়েছেন। পাশাপাশি জাদুশিল্পের মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে নিজের দেশকে বিদেশের কাছে তুলে ধরেছেন ভিন্ন মাত্রায়।

সেই জুয়েল আইচ সিডনিতে আসছেন দ্বিতীয়বারের মত। তাঁর নির্ধারিত শো টি ২৩ অক্টোবর কেম্পসীর ওরিয়ন সেন্টারে। জুয়েল আইচ আপনাকে স্বাগতম - সুস্বাগতম। আপনার সৌরভ-গৌরবের আভা মেখে আমরাও হবো গৌরবান্বিত। আপনার অনুষ্ঠান সফল হোক। একুশে একাডেমিকে অভিনন্দন এমন একটি সুকুমার আয়োজনের জন্য।

পুনশ্চ: জুয়েল আইচের জাদু দেখতে অবশ্যই যাবো। তবে অবশ্যই এ বয়সে এসে তা কপি করার সে সাহস আমার আর নেই। তাছাড়া আমার মা টাও আজ আর বেঁচে নেই যিনি আমাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

তথ্যসূত্র: জুয়েল আইচ ফেসবুক প্রফাইল, দৈনিক যুগান্তর, ম্যাজিক লাইব্রেরী